সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার উপায়

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা প্রথমে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম' এর একটি ঘটনা সম্পর্কে জানব। এই ঘটনার বিষয়ে আমরা নিজেদের মতামত প্রদান করব। এরপর নিজেদের মতামতের ভিন্নতা নির্ধারণ করব। পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ইতিহাসের বিষয়বস্তু পাঠ করব। এরপর খেলার মাধ্যমে তথ্য কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তা জানব। 'বৃটিশ আমলের শাসন ব্যবস্থা' নিয়ে কয়েকজন লেখক ও গবেষকের লেখা পড়ব। এই লেখা পাঠ করে লেখকদের মতামতের ভিন্নতাগুলো নির্ধারণ করব। এরপর আমরা ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের দুইজন ব্যক্তি নির্ধারণ করব। দুইজন ব্যক্তির কাছে একই ঐতিহাসিক ঘটনার মতামত সংগ্রহ করব। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মতামতের ভিন্নতায় কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ধারণ করব।

চলো তাহলে আমরা একটি ঘটনা সম্পর্কে জেনে নিই।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সব সময় শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছেন বার বার। তার লেখায় ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আবেদন। তাইতো তিনি জীবনে অনেক বার হয়েছেন কারাবন্দি। ব্রিটিশরা তাঁকে রাজদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। অন্যদিকে বাংলার মানুষের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন বিদ্রোহী কবি হিসেবে। তার লেখা গান ও কবিতা আজও আমাদের উদ্দীপ্ত করে। আজও আমরা খুঁজি পাই যেকোনো অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি।

অনুশীলনী ১:

আমরা এখন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী চেতনা সম্পর্কে নিজেদের মতামত লিখি। প্রয়োজনে আমরা বিভিন্ন উৎসের সহায়তা নিতে পারি।

আমরা নিজেদের মতামতগুলো উপস্থাপন করি। সহপাঠীদের উপস্থাপনা শুনে আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি, জাতীয় কবির বিদ্রোহী চেতনা আমাদেরকে ভাবিয়েছে। আমরা নানান দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে নিজেদের মতামত প্রদান করেছি।

লক্ষ্য করলে দেখব, ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী কবিকে রাজদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু বাংলার মানুষ এখনও তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন শোষণ ও নীপিড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক নির্ভীক যোদ্ধা ও বিদ্রোহী কবি হিসেবে। এভাবেই একই ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন মতামত বা বয়ান তৈরি করে।

এখন আমরা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে ইতিহাস জানার উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী চেতনা সম্পর্কে নিজের মতামত :

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিদ্রোহী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। এ কারণেই তিনি ভূষিত হন 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে। আজীবন সংগ্রাম করেছেন শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য। সোচ্চার ছিলেন সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে। তরুণদের কাছে তিনি বিদ্রোহের অনন্ত প্রতীক। চির উন্নত শির কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর মাত্র দুই যুগের সৃষ্টিকর্মজুড়ে পরাধীন দেশের মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন। মানবতার কল্যাণের নিমিত্তে তিনি বিদ্রোহী বা বিপ্লবী মনোভাব পোষণ করেন। যৌবনকালে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যুদ্ধের ভয়াবহতা, বিদেশি শাসনের গ্লানি, বঙ্গভঙ্গ, খেলাফত আন্দোলন প্রভৃতি। এগুলো তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব জাগ্রত করে। তিনি জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়েছেন। তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে আত্মশক্তি ও বিদ্রোহী চেতনা। তিনি দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য বিদেশি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় বলেছেন-

'আমি দুর্বার,
আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার।
আমি অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল ,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।'

কবিতার মতো সংগীতেও নজরুল মানুষকে বিদ্রোহের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকেই তাঁর প্রধান অন্বিষ্ট বলে বিবেচনা করেছেন।নজরুল হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মানবধর্ম লালন করার কথা বলেছেন। তিনি কল্পনা করেছেন এক সাম্যবাদী সমাজের, যেখানে নেই শোষণ, বৈষম্য আর সাম্প্রদায়িক বিভেদ। তিনি ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে মানবতাকে সবচেয়ে বড় করে দেখার জন্য 'মানুষ' কবিতায় আরও বলেছেন-

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ,অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।'

পহেলা বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ। গ্রামের মাঠে বৈশাখী মেলা দেখার দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে মরিয়মের। জীবনে প্রথমবার সে মাটির পুতুল, খেলনা, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, লাঠিখেলা দেখেছে। গ্রামের সকল ধর্মের সকল মানুষকে মিলেমিশে একসঙ্গে আনন্দ করতে দেখেছে। মেলায় আসার আগে মরিয়মের দাদু ওকে নিয়ে গিয়েছিল বাজারের বড়ো একটি দোকানে যেখান থেকে তাঁদের সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হয়। দাদুর কাছ থেকে মরিয়ম শুনেছে, বাংলা সন চালুর পর থেকে নাকী ব্যবসায়ীরা হালখাতা আয়োজন করেন। বঙ্গাব্দের প্রথম তারিখে প্রতিটি দোকানে হিসাবের নতুন খাতা খোলা হয়। পুরাতন বছরের সকল হিসাব নিকাশ শেষ করে নতুন খাতায় শুরু হয় হিসাবের নতুন যাত্রা। রীতি হিসেবে চলে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়া।

বৈশাখী মেলার মাঠে নাগরদোলা, মাটির খেলনা, চরকী, বাঁশি, রঙিন বেলুনসহ নানা রকমের খেলনা পাওয়া যায়। সবাই নতুন পোশাকে সেজে মেলায় আসে। নানান রকমের খেলনা কেনে, খাবার কেনে, নাগরদোলায় চড়ে। দেখতে খুব ভালো লাগে।

মরিয়ম আনন্দমনে তার অভিজ্ঞতার গল্প বলে চলেছে। কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল মাইকেল, রেণু, নীলান্ত আর মাসুদ। চোখেমুখে নতুন কিছু দেখা, জানা ও শেখার আনন্দ নিয়ে নীলান্ত যোগ করল, নৌকা বাইচের কথা।

নীলান্ত বলল, এবারই প্রথম সে নৌকা বাইচ দেখেছে তাঁদের গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীতে। নদীর দুই পাড়ে চলছিল কয়েক হাজার মানুষের আনন্দ-উৎসব। ছয়-সাতটি দল বাইচে অংশ নিচ্ছিল। মাঝি ভাইদের গানে গানে আর ছন্দে ছন্দে চলছিল নৌকাবাইচ। মরিয়ম আর নীলান্তের আনন্দ-অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে অনেক প্রশ্ন এসে ভীড় করেছে ওদের মাথায়।

রেণু বলল, শুনেছি আমাদের নানু, দাদুদের সময়ে এবং তার বহু আগেও নাকী বড়ো আয়োজনে বৈশাখী মেলা বসতো। দোকানে দোকানে হালখাতা হতো। আয়োজন করা হতো নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা।

নৌকাবাইচ বাংলার আবহমান সংস্কৃতির অংশ। মাঝি ভাইদের গানে গানে আর ছন্দে ছন্দে চলে নৌকা বাইচ। নানা রকমের নকশা আর রঙের কারুকার্য থাকে প্রত্যেকটি নৌকায় আর বৈঠায়। মাঝি ভাইদের পরনে থাকে সুন্দর পোশাক। নদীর দুই তীরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী মানুষ মাঝি ভাইদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হল্লা করে। সবাই দেখতে চায়, কে সবার আগে গন্তব্যে পৌঁছায়, কোন নৌকাটি জয়ী হয়!

আচ্ছা, এগুলোর ইতিহাস জানার উপায় কী?

ষষ্ঠ আর সপ্তম শ্রেণিতে ইতিহাস জানার উপায় অনুসন্ধান করে অর্জিত জ্ঞান থেকে রেণুর দিকে তাকিয়ে মাইকেল বলল, আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরিতে ইতিহাসের অনেক বই আছে। সেইসব বই থেকে এবং নানু-দাদু আর গ্রামের মুরুব্বিদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু তথ্যগুলো পাওয়াই কেবল যথেষ্ট নয়, এগুলোকে ইতিহাস গবেষণার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির মতো একের পর এক প্রশ্ন করে, যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সমালোচনামূলক অনুসন্ধান করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

অনুসন্ধানী কাজ

দলভিত্তিক উপস্থাপনা

শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিলেন। তারপর তিনি মজার একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করলেন। চলো, নিচের ছবিগুলো থেকে পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ ও শোভাযাত্রার ইতিহাস নিয়ে দলভিত্তিক একটি লেখা তৈরি করি এবং তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করি। এই কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য তোমরা ইন্টারনেট ছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ 'বাংলাপিডিয়া'য় প্রকাশিত এবং এই বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট অংশে উল্লিখিত তথ্য থেকেও প্রয়োজনমতো সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কাকে বলে?

চলো এবার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কাকে বলে তা জেনে নেয়া যাক। ভূ ও খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা-যোগাযোগ, বিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই পৃথক হয়। এই পার্থক্যই মানুষকে ভিন্ন অভিজ্ঞতা আর পরিচয় দান করে। পৃথিবীর বুকে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নানান চ্যালেঞ্জ আর প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে টিকে থাকার পথে মানুষের সকল কর্মকাণ্ডই হলো সংস্কৃতি। সমাজ হলো সেই সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান একটি উপকরণ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পরিস্থিতি আর প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষের সমাজ আর সংস্কৃতির প্রতিনিয়ত রূপান্তর ঘটে চলেছে। ইতিহাস পাঠ থেকে এই রূপান্তরের কালানুক্রমিক পর্যায়গুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আরও ধারণা পাওয়া যায়, একটি ভূখণ্ডে মানুষ অতীতে কীভাবে বসবাস করত, তাঁদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল সেই সম্পর্কেও। সমাজের নানান উপাদানের পরিবর্তন ও রূপান্তর অনুধাবনের জন্য কালানুক্রমিক গবেষণাভিত্তিক যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তাই হলো সামাজিক ইতিহাস। একইভাবে যখন মানুষের নানান কর্মকাণ্ডের কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা করা হয়, তখন তা সাংস্কৃতিক ইতিহাস হয়ে ওঠে। ইতিহাস যাঁরা জানার ও লেখার চেষ্টা করেন, তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে অতীতকালের বিভিন্ন উৎস ও উপাদান খুঁজে বের করেন। সেগুলোর ভিত্তিতে যথাযথ গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে অতীতে সমাজ ও সংস্কৃতি কেমন ছিল, তা জানার চেষ্টা করেন।

তোমার মতে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কাকে বলে?

শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে উপস্থাপন করো।

অনুসন্ধানী কাজের বিষয়বস্তু : পহেলা বৈশাখ/বাংলা নববর্ষ ও শোভাযাত্রার ইতিহাস

অনুসন্ধানের প্রশ্নমালা : ১.পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ কিভাবে প্রচলন হয়?

২.শোভাযাত্রা কিভাবে প্রচলন হয়?

পহেলা বৈশাখ/বাংলা নববর্ষের ইতিহাস : পহেলা' শব্দের অর্থ 'প্রথম' এবং 'বৈশাখ' বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস। পহেলা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন। এ দিনটি বাংলাদেশে নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়। দিনটি সকল বাঙালি জাতির ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণের দিন। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। ত্রিপুরায় বসবাসরত বাঙালিরাও এই উৎসবে অংশ নিয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশে জাতীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙালিদের একটি সর্বজনীন লোকউৎসব হিসাবে বিবেচিত। পহেলা বৈশাখ উদযাপনের শুরু হয়েছিল পুরান ঢাকার মুসলিম মাহিফরাস সম্প্রদায়ের হাতে। এই দিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদযাপিত হয় নববর্ষ। পহেলা বৈশাখের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল যুগ থেকে শুরু হয় বলে মনে করা হয়, যখন সম্রাট আকবর ফসল কাটার মরশুমের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন কর ব্যবস্থা চালু করেন। এটি বাংলা নববর্ষের সঙ্গে মিলে যায়, যা ঐতিহ্যগতভাবে স্থানীয় জনগণের দ্বারা উদযাপন করা হয়।

শোভাযাত্রার ইতিহাস : বৈশাখী উদযাপনের ইতিহাস কয়েকশ বছরের পুরনো হলেও মঙ্গল শোভাযাত্রার ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয়। মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯৮৫ সালের পহেলা বৈশাখে যশোরে। তখন দেশে ছিল সামরিক শাসন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের লোকজ সংস্কৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা। আর সেই শোভাযাত্রায় অশুভের বিনাশ কামনা করে শুভশক্তির আগমনের প্রার্থনা করা হয়। এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন চারুশিল্পী মাহবুব জামাল শামিম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে পড়াশোনা শেষ করে যশোরে চলে যান তিনি। যশোরে গিয়ে চারুপিঠ নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত যশোরে সীমাবদ্ধ থাকেনি মঙ্গল শোভাযাত্রা। ১৯৮৯ সালে পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকেও শুরু হয় এই মঙ্গল শোভাযাত্রা। শুরুতে এর নাম 'আনন্দ শোভাযাত্রা' ছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাকে মাথায় রেখেই এমনটা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এটি 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' হিসেবেই পরিচিত হয়।

তোমার মতে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কাকে বলে?
শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে উপস্থাপন করো।

নমুনা উত্তর :

সামাজিক ইতিহাস :

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাই সামাজিক ইতিহাস। মানুষ অতীতে কিভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতো, তখন মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল এবং সমাজের নানান উপাদানের অতীত বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন যখন বোঝার চেষ্টা করা হয় তখন তা সামাজিক ইতিহাস হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সমাজের নানান উপাদানের পরিবর্তন ও রূপান্তর অনুধাবনের জন্য কালানুক্রমিক গবেষণাভিত্তিক যে প্রচেস্টা গ্রহণ করা হয় তাই হলো সামাজিক ইতিহাস।

সাংস্কৃতিক ইতিহাস :

মানুষের নানাবিধ কর্মকান্ড যেমন- আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতিনীতির ধরন এবং পরিবেশের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া ইতিহাস হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলে তা সাংস্কৃতিক ইতিহাস হিসেবে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ যখন মানুষের নানান পরিচয়, গোত্র, পরিবার, গোষ্ঠী, জীবনাচরণ ও একদল মানুষের সাথে আরেকদল মানুষের সম্পর্কের পরিবর্তন নিয়ে যখন ইতিহাস লেখা হয়, তখন তা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস কত ধরনের হয়?

তোমরা যদি বাংলা অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও পরিবর্তনের প্রাচীন ইতিহাস জানতে ও বুঝতে চাও তাহলে কী ধরনের উৎস বা উপাদান অনুসন্ধান করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে, চলো তা অনুধাবনের চেষ্টা করি। দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা যখন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও রূপান্তরের ইতিহাস অনুসন্ধান করবে, তখনো ইতিহাসের উৎস বা উপাদান সম্পর্কে জানতে ও শিখতে পারবে। আর তোমরা তো ইতোমধ্যেই জেনেছ যে, ইতিহাস হতে হলে সকল প্রকার উৎসের ত্রুটি-বিচ্যুতি আর সমস্যাগুলোর চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। উৎসগুলোকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই করতে হয়। সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তবেই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

খুব সহজ করে মনে রাখার জন্য দুই ধরনের উপাদানের কথা বলা যেতে পারে। এক, সাহিত্যিক উৎস। দুই, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস। বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা অতীতে কেমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিলেন তার অনেকটাই জানা যাবে এই উৎসগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। সাহিত্যিক উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে তালপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি, চর্যাপদ, বিভিন্ন ধরনের কাব্যসংকলন, আইনশাস্ত্র, চিকীৎসাশাস্ত্র, কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ, ভ্রমণ বিবরণী ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসগুলোর মধ্যে শিলালিপি, তাম্রশাসন, টেরাকোটা, মৃৎপাত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎসগুলো নিচে উল্লেখ করি-

১। তালপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি	২। বিভিন্ন মূর্তি-প্রতিচ্ছবি
৩। মুদ্রা-শিলালিপি	৪। স্মৃতিস্তম্ভ এবং অট্টালিকা
৫। পাণ্ডুলিপি	৬। তাম্রলিপি
৭। টেরাকোটা	৮। প্রাচীন পুথি
৯। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা	১০। প্রাচীন সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকগণ রেখে গেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতামূলক নানান বর্ণনা। এসব উৎসের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে। মানুষের বিস্মৃত নানান ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বয়ান জানা যাবে।

প্রাচীন লিপি পাঠোদ্ধারের কাজ কী ইতিহাসবিদর?

মনে রাখবে, ইতিহাসের যত আদিকালে তোমরা প্রবেশ করবে, ভিন্ন ভিন্ন উৎসের সঙ্গে পরিচিত হবে। দেখবে যে, ইতিহাসের উৎস কত বিচিত্র প্রকার হতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রীর পাশাপাশি নানান ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও দলিলাদি উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতি শতকে সেই ভাষার ঘটেছে পরিবর্তন, বিবর্তন, রূপান্তর। প্রাচীনকালে দেখা যায়, বহুবিচিত্র ভাষার বহুবিচিত্র ধরন। সেগুলো পাঠোদ্ধার করাও তাই সহজ কথা নয়। পাঠোদ্ধারের এই কাজ করে থাকেন প্রাচীন লিপিবিশারদগণ, লিপিবিদ্যায় পারদর্শী

ভাষাবিদগণ। পাঠোদ্ধারের কাজ ইতিহাসবিদের নয়। ইতিহাসবিদের কাজ পাঠোদ্ধারকৃত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য কীভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হয় সেই বিষয় জানা। অপরাপর সহায়ক উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কীভাবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তার কলাকৌশল জানা। পাঠোদ্ধারকৃত লিখিত উৎস কীভাবে অনুসন্ধান করতে হয়, উৎস থেকে কীভাবে তথ্য বের করে আনতে হয় ইতিহাসবিদকে তা জানতে হয়। একইসঙ্গে সেই তথ্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য আর বিশ্বাসযোগ্য তা যাচাই-বাছাই করে কীভাবে নৈর্ব্যক্তিক আর যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় সেই দক্ষতা ও যোগ্যতা একজন ইতিহাসবিদের থাকা প্রয়োজন।

বাংলা অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার উপায়

এবার বাংলা অঞ্চলে প্রাপ্ত সাহিত্যিক উৎস থেকে কীভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যগুলোকে যাচাই-বাছাই করতে হয় তা অনুসন্ধান করে দেখা যাক। প্রথমেই জানা যাক, সাহিত্যিক উপাদানগুলো কী কী? এগুলো থেকে আমরা কীভাবে অতীতের তথ্যগুলো গ্রহণ করতে পারি?

সাহিত্যিক উৎস বা উপাদানে প্রাপ্ত সব তথ্যই কী ইতিহাস?

আঞ্চলিক বাংলায় ত্রয়োদশ০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যেসব সাহিত্যিক উৎস পাওয়া গেছে, তার মধ্যে শব্দপ্রদীপ, রামচরিতম, সুভাষিত রত্নকোষ, কৃষিপরাশর, কালবিবেক, দানসাগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলোকে ইতিহাসের প্রাথমিক উৎস বলা হয়ে থাকে। প্রাথমিক উৎসকে মৌলিক উৎসও বলা হয়। এগুলোতে অতীতে বাংলা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা, কৃষিজাত ফসল, দৈনন্দিন জীবনের চিত্র, চিকীৎসা ও আইনবিষয়ক তথ্য, সাধারণ মানুষের বিদ্রোহসহ নানান তথ্য রয়েছে। যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে করতে পারলে এসব তথ্য থেকে তৎকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপরেখার অনেকটাই পাওয়া যেতে পারে। কারণ, তোমরা জেনেছ যে, উৎস বা উপাদানে প্রাপ্ত সব তথ্যই সত্য নয়। সাহিত্যিক উৎস থেকে তথ্য গ্রহণের আগে খোঁজ নেওয়া দরকার, উৎসটি কার হাতে তৈরি? কাদের জন্য তৈরি? ঐ উৎসে কাদের কথা বলা হয়েছে? উৎসটি নির্ভরযোগ্য নাকী পক্ষপাতদুষ্ট? এমন অনেক প্রশ্নের মাধ্যমে উৎসটির সত্যতা ও নিরপেক্ষতা যাচাই করতে হয়। তারপরই কেবল গ্রহণযোগ্য তথ্যটুকু নিয়ে ইতিহাসের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাহিত্যিক উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এখানে কবি বা লেখক একজন মানুষ। তাঁর আবেগ-অনুভূতি, কল্পনা, ব্যক্তিগত ভালো লাগা, মন্দ লাগা এ বিষয়গুলো লেখায় স্থান পাচ্ছে কীনা। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজে দেখতে হবে, একজন লেখক যদি কোনো শাসকের সময় কিংবা অনুগ্রহে লেখার কাজটি করেন তাহলে সেই শাসক বা রাজাকে খুশি করার জন্য অযথা প্রশংসার আশ্রয় নিতে পারেন। সমসাময়িক অন্য রাজা বা শাসককে খাটো করে দেখতে পারেন। এই অতিরিক্ত প্রশংসা কিংবা অতিরিক্ত সমালোচনা অর্থাৎ যেকোনো প্রকার অতিরঞ্জন ইতিহাস রচনাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই অতিরঞ্জিত বিষয় বাদ দিয়ে যৌক্তিক আর গ্রহণযোগ্য অংশটুকুই কেবল ইতিহাসে স্থান পায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদান থেকে ইতিহাস জানার উপায়

এবার জানবো প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সম্পর্কে। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদানগুলো পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে মানুষের প্রাচীন ইতিহাস লেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার জন্যও এগুলোর ওপর ইতিহাসবিদগণ নির্ভর করে থাকেন। সাহিত্যিক উৎসের তুলনায় এগুলো অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ এবং বিশ্বস্ত। সাহিত্যিক উৎসের পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস ব্যবহার করা গেলে অতীতের যেকোনো ঘটনা অনেক বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ পাওয়া যায়। তবে বাংলা অঞ্চলের

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উভয় উৎসের কিছুটা অভাব রয়েছে। উপাদানগুলোর অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। তা সত্ত্বেও, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে তথ্য রয়েছে তুলনামূলক বিচারে সেগুলো অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য, গ্রহণযোগ্য। ইতিহাস রচনার কাজে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদানের ব্যবহার নিয়েও একজন ইতিহাসবিদের অনেক প্রশ্ন থাকে। যেমন: কোন কোন বস্তু বা উপকরণ প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? কোথায় কোথায় এ ধরনের উপাদান পাওয়া যায়? এগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রথা-পদ্ধতি কী অনেক কঠিন? এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে একজন ইতিহাসবিদ অনুসন্ধানে নামেন এবং উৎসগুলোতে বিদ্যমান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাংলা অঞ্চলে যেসব প্রত্নস্থল রয়েছে এবং খননকাজ চালানো হয়েছে, তারমধ্যে পান্ডু রাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুগড়, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুর, উয়ারী-বটেশ্বর, বিক্রমপুর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যেও ধরনগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন: বাংলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত পাণ্ডু রাজার ঢিবি হচ্ছে একটি তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা। অন্যদিকে তাম্রলিপ্তি হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম একটি সমুদ্র বন্দর নগর। চন্দ্রকেতুগড়ও একটি বন্দর নগর। কর্ণসুবর্ণ বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমাংশের একটি রাজধানী নগর। মহাস্থানগড় বাংলার উত্তরাংশের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র। এটি রাজধানী হিসেবেও গড়ে উঠেছিল। পাহাড়পুর ছিল মহাস্থানগড়ের কাছেই অবস্থিত একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ময়নামতির দেবপর্বত ছিল বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও নগর কেন্দ্র। দেবপর্বত নামে একটি রাজধানীরও পরিচয় পাওয়া গেছে। বাংলার পূর্বাংশের অপর দুটি প্রত্নস্থল হলো উয়ারী-বটেশ্বর ও বিক্রমপুর। এর মধ্যে উয়ারী-বটেশ্বর বাণিজ্যিক এবং বিক্রমপুর রাজধানী নগর হিসেবে গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি প্রত্নস্থলেই প্রাচীনপর্বে বাংলার আঞ্চলিকভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপনকারী মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও পরিবর্তনের মূল্যবান নিদর্শনাবলি পাওয়া গেছে।

জাদুঘরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস/উপাদান

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা উপরে উল্লিখিত প্রত্নস্থলগুলোর ভৌগোলিক এবং সপ্তম শ্রেণিতে অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছ। সপ্তম শ্রেণিতে এই অঞ্চলের মুদ্রা সম্পর্কেও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেক তথ্য জানতে পেরেছ। এছাড়াও ধ্বংসপ্রাপ্ত বা পরিত্যক্ত স্থাপনা, পোড়ামাটির ফলক, মাটির পাত্র, বিভিন্ন ধরনের লিপি (শিলালিপি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেনের দলিল বা তাম্রশাসন, প্রশস্তিলিপি, মূর্তিলিপি, স্মারকলিপি ইত্যাদি), অলংকার, ভাস্কর্য, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, শিল্পপণ্যসহ বহুবিচিত্র বস্তুগত নিদর্শন প্রত্নস্থলে পাওয়া যায়।

এই নিদর্শনাবলি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। জাদুঘরটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত। সারা পৃথিবীতে মানুষের অতীত ইতিহাসের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনগুলো জানা ও বোঝার জন্য নানান নিদর্শনাবলি সংরক্ষণ করা হয়। জনসাধারণ এই জাদুঘরগুলো পরিদর্শন করে উল্লিখিত সকল নিদর্শন দেখতে পারেন। নিজের সাংস্কৃতিক শিকড় অনুসন্ধান ও অনুধাবন করতে পারেন। বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে পঞ্চাশটির বেশি জাদুঘর রয়েছে। চলো কয়েকটি বিখ্যাত জাদুঘরের নাম জেনে নেয়া যাক:

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (ঢাকা), লালবাগ কেল্লা জাদুঘর (ঢাকা), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (ঢাকা), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর (ঢাকা), টাকা জাদুঘর (ঢাকা), বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর (সোনারগাঁ), গণহত্যা জাদুঘর (খুলনা), জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর (চট্টগ্রাম), বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (রাজশাহী), মহাস্থান

জাদুঘর (বগুড়া), পাহাড়পুর জাদুঘর (নওগাঁ), ময়নামতি জাদুঘর (কুমিল্লা), উপজাতীয় সাংস্কৃতিক জাদুঘর (ময়মনসিংহ ও রাঙ্গামাটি), লালন জাদুঘর (কুষ্টিয়া), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি (কুষ্টিয়া), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়ি স্মৃতি জাদুঘর (সিরাজগঞ্জ) ইত্যাদি।

কার্বন-১৪ কলাকৌশল

বিভিন্ন প্রত্নস্থলে খনন করে যেসব উপাদান পাওয়া যায় তার বয়স বা সময়কাল নির্ণয় করা যায় কার্বন-১৪ নামের একটি পরীক্ষার মাধ্যমে। তার মানেযেকোনো স্থানে পাওয়া জিনিসপত্রই কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান নয়। প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো যখন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, তখনই কেবল এগুলো প্রত্ন-উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। আর কার্বন-১৪ পদ্ধতি সম্পর্কে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়ে বিস্তারিত জেনেছ। এই পদ্ধতির প্রয়োগ এগুলোর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে বা সময় নির্ধারণে সাহায্য করে। ফলে, এ ধরনের উপাদান সাহিত্যিক উপাদানের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে গৃহীত হয়।

তাম্রশাসন কেন প্রাচীনকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস?

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোর মধ্যে তাম্রশাসন খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলা যেতে পারে, প্রাচীনকালের সবচেয়ে বিশ্বস্ত উৎস বা উপাদান। এটা সবচেয়ে বিশ্বস্ত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই উৎসের কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা নেই। তাম্রশাসন মূলত ভূমি লেনদেন কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল। তাম্রপট্ট বা তামার পাতের ওপর খোদাই করে লিখিত হতো বলেই এগুলোকে তাম্রশাসন বলা হয়ে থাকে। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল হলেও তাম্রশাসনগুলোতে আরও অনেক কিছু বর্ণনা করা হতো। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুন আর প্রশাসনিক ব্যবস্থার চিত্র এখানে তুলে ধরা হতো। যে জমি দান, বিক্রি বা কেনা হবে তার অবস্থান, স্থানের নাম, শাসকের নাম, গাছগাছালি, সে সময়ের ধর্ম-বিশ্বাস, হাট-বাজারসহ পারিপার্শ্বিক সমাজ জীবনের নানান তথ্য তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ করা হতো। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, আঞ্চলিক বাংলায় এই ধরনের প্রায় পাঁচ শতাধিক তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এগুলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সহ বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত রয়েছে। বাংলা অঞ্চলে প্রাপ্ত শতাধিক তাম্রশাসন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জাদুঘর ও প্রতিষ্ঠানেও সংরক্ষিত আছে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লেখা এ সব তাম্রশাসনের মধ্যে মাত্র দেড় শতাধিক তাম্রশাসন পাঠোদ্ধার করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকায় এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন এই মহামূল্যবান দলিলের অনেকগুলোই এখন পর্যন্ত পাঠোদ্ধারের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রাচীনকালের তাম্রশাসনগুলো থেকে তথ্য উদ্ধারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাংলার আঞ্চলিকভূখণ্ডে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি গঠন ও রূপান্তরের আরও অনেক আকর্ষনীয় তথ্য জানা যাবে। এর মাধ্যমে ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজ এগিয়ে যাবে বহুদূর। তোমরা মনে রাখবে, প্রাচীন এই উৎসগুলো বিভিন্ন যুগে আঞ্চলিক বাংলার মানুষের বহুমাত্রিক সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পরিবেশ, সুখ-দুঃখের নানান চিত্র, অনুষ্ঠান, রীতি-নীতিকে ধারণ করে। তবে যে রাজার সময়ে উৎকীর্ণ বা জারি করা হতো তাম্রশাসনগুলো-তে সেই রাজা ও তাঁর বংশের গুণকীর্তন করা হতো। ইতিহাসসম্মত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে, সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এই গুণকীর্তন থেকেও সত্যটুকু খুঁজে বের করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

মৃৎপাত্র এবং পোড়ামাটির ফলক থেকে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ

তাম্রশাসন ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের মৃৎপাত্র। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, বাংলা অঞ্চলে এমন কিছু মৃৎপাত্র তৈরি হতো যা বাংলার বাইরেও রপ্তানি হতো। অত্যন্ত মসৃণ, কালো রংয়ের কিছু মৃৎপাত্র পাওয়া যেত, যেগুলো বাংলা এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত ছিল। বাংলা অঞ্চলের মাটি ছিল এই ধরনের মৃৎপাত্র তৈরির অন্যতম কাঁচামাল। এগুলো থেকে তৎকালীন সময়ের সাংস্কৃতিক জীবনের মান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এগুলো দৈনন্দিন জীবনের পাশাপাশি নগর-সভ্যতার সময়কাল নির্ধারণেও সাহায্য করে। প্রত্নস্থলে পাওয়া একটি পাত্রের গড়ন, নকশা প্রভৃতি দেখে সেই ধারণা পাওয়া যায়, মানুষ কতবছর আগে এইগুলো ব্যবহার করত।

পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলো যেন অতীত মানুষের জীবনের বাস্তব প্রতিরূপ। ফলকে অঙ্কীত থাকে নানান রকমের চিত্র। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘটনা, পশুপাখি ও জীবজন্তু, নারী সমাজের কর্মমুখর দিনলিপি, সাধারণ মানুষের অবসর-বিনোদন, সংস্কৃতির প্রতীক, বিভিন্ন ধর্মের দেব-দেবী, ফুল-লতাপাতাসহ বিচিত্র সব দৃষ্টিনন্দন চিত্র ফলকে আঁকা থাকে। অনেক সময় রাজার যুদ্ধযাত্রার চিত্রও পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটায় ফুটিয়ে তোলা হতো।

কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই এবং পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারে পোড়ামাটির অসংখ্য ফলক পাওয়া গেছে। নদীমাতৃক বাংলার সহজলভ্য কাদামাটির সরবরাহ এই শিল্পকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল, জনপ্রিয় করে তুলেছিল। প্রথমদিকে ফলকগুলো দেয়াল সুসজ্জিত করার জন্য ব্যবহার করা হলেও পরে বৃষ্টির পানিতে যেন দেয়াল নষ্ট না হয়, সে উদ্দেশ্যেও এগুলো ব্যবহার করা হয়।

মৃৎশিল্পীরা তাঁদের চারপাশে যা কিছু দেখতেন তাই নিজেদের সৃষ্টিশীল চিন্তার মাধ্যমে ফলকগুলোকে ফুটিয়ে তুলতেন। ফলে মানুষের জীবনের কর্মবহুল ও ঘটনাবহুল বহু বিষয় ফলকগুলোতে স্থান পেয়েছে। পৌরাণিক কাহিনি, ধর্মীয় প্রতীক, জীব-জন্তু ও পাখির ছবি, মানুষে-মানুষে যুদ্ধ, হিংস্র জন্তুর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধরত অবস্থার ছবি, মাছ, পদ্ম ও সূর্যমুখী ফুল, হালচাষরত কৃষক, অবসরে যুবকদের আড্ডাসহ নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের সমাহার পোড়ামাটির ফলকে পাওয়া যায়।

পোড়ামাটির ফলকে হাতে আঁকা ছবি

পোড়ামাটির ফলক দেখে ইতিহাস শিখি

নিচে পোড়ামাটির ফলকের চিত্র দেয়া হলো। এই ফলকগুলোতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কী কী চিত্র দেখতে পাচ্ছ তা খাতায় লিখে ক্লাসে সকলের সামনে উপস্থাপন করো।

প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির বিভিন্ন ধরনের ফলক

ইতিহাসের উৎস হিসেবে বণিক ও পর্যটকদের লেখা বিবরণী বা ভ্রমণকাহিনিগুলো কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

ত্রয়োদশ০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সময়ের আঞ্চলিক বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্য জানার আরও একটি উপাদান রয়েছে। আর তা হলো বিভিন্ন সময়ে বাংলা অঞ্চলে আগত পর্যটকদের বিবরণ। পর্যটকদের বিবরণগুলোকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। গ্রীক-রোমানদের বিবরণ, চৈনিকদের বিবরণ এবং আরবদের বিবরণ।

গ্রিক-রোমানদের বর্ণনা

গ্রিক-রোমানদের মধ্যে মেগাস্থিনিস, টলেমি, প্লিনির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বর্ণনায় আঞ্চলিক বাংলার ভৌগোলিক তথ্য বেশি পাওয়া যায়। সাধারণ পূর্বাব্দ চতুর্থ শতকে মেগাস্থিনিসের লেখা ‘ইন্ডিকা’ নামক গ্রন্থে আমরা গঙ্গারিডাই রাজ্যের নাম পাই; যা মূলত আঞ্চলিক বাংলাকেই বোঝানো হয়েছে। এটি ছিল মূলত গঙ্গা নদীর দুটি স্রোতোধারার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ। অর্থাৎ বাংলার পশ্চিমে ভাগীরথী এবং পূর্বে পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ। এই ভূভাগের মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, মুন্সিগঞ্জসহ দক্ষিণের বেশ কিছু জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, তমলুক এবং কলকাতা সহ ভাগীরথী নদীর পূর্ব পাশের কয়েকটি জেলা।

এই ভূখণ্ডটিই বেঙ্গাল ডেল্টা বা বঙ্গীয় ব-দ্বীপ নামে পরিচিত। টলেমি ও প্লিনির বর্ণনায় (প্রথম শতকের) আঞ্চলিক বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ, বিভিন্ন উপ-অঞ্চলের অবস্থান, পণ্য-দ্রব্যের দাম বিশেষত বস্ত্র, বণিকদের জীবনযাত্রা, বাংলার সমৃদ্ধির নানান চিত্র ফুটে ওঠে। তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বাংলা কিংবা বেঙ্গাল কিংবা বাংলাদেশ বলে কোনো নামের অস্তিত্ব কিন্তু সেই সময় ছিল না। প্রাকৃতিক সীমানা দিয়ে ঘেরা একটি অঞ্চল ছিল যেখানে কাল পরম্পরায় ‘বাংলা ভাষা’ গড়ে উঠেছে সেইভূখণ্ডটিকেই ‘বাংলা’ নাম-পরিচয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এইভূখণ্ডে বিভিন্ন সময়ে বসতি স্থাপনকারী মানুষেরা সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি গড়ে তুলেছে।

পোড়ামাটির ফলক দেখে ইতিহাস শিখি

নিচে পোড়ামাটির ফলকের চিত্র দেয়া হলো। এই ফলকগুলোতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কী কী চিত্র দেখতে পাচ্ছ তা খাতায় লিখে ক্লাসে সকলের সামনে উপস্থাপন করো।

প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির বিভিন্ন ধরনের ফলক

নমুনা উত্তর :

উপরের ফলকগুলোতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যেসব চিত্র দেখতে পাচ্ছি তা নিচে দেওয়া হলো -

১ম ছবির ফলকটির মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন কর্মজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষজন কাধে করে পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে।

২য় ছবির ফলকটির মাধ্যমে সেই সময়ের রাজার যুদ্ধযাত্রার কয়েকটি দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল, যুদ্ধের হাতি, ঘোড়া ইত্যাদির প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও এখানে নৃত্যরত নারী পুরুষের প্রতিকৃতি ও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

চৈনিকদের বর্ণনা

চীনদেশ থেকে আসা পর্যটকগণ মূলত বৌদ্ধধর্মের নানান ধারা-উপধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বাংলা অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁদের বর্ণনা থেকে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতির বিস্তার, মানুষের সমাজের নানান দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ফা-সিয়ানের (পঞ্চম শতক) বর্ণনায় আমরা বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীনতম আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর তাম্রলিপ্তির কথা জানতে পেরেছি। এই বন্দর নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তমলুক জেলায়।

ফাসিয়ান (ফাহিয়েন), ইজিং (ইৎসিং), যুয়ান জাং (হিউয়েন সাং) সহ অনেক পর্যটক বিভিন্ন সময়ে বাংলা অঞ্চলে এসেছেন। তাঁদের বর্ণনায় ওঠে এসেছে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানান খন্ড-চিত্র। বিশেষ করে যুয়ান জাং-এর বিবরণ থেকে আমরা বাংলা অঞ্চলে হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতির নানান শাখা-প্রশাখার নানান রূপ খুঁজে পেয়েছি। সপ্তম শতকের এই পর্যটক বাংলার প্রায় সব কয়টি উপ-অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন এবং প্রতিটি স্থানের সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষ, ধর্ম এমনকী কৃষিকাজের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যুয়ান জাং-এর বিবরণ তাই ইতিহাসের মূল্যবান উৎস।

আরবদের বর্ণনা

একইভাবে আরবভূখন্ড থেকে আসা নাবিক ও বণিকদের বর্ণনায় আমরা নবম শতকের পর হতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়ের নানান তথ্য পাই। আরবদের বর্ণনায় বাংলার বাণিজ্যিক তথ্য বেশি পাওয়া যায়। মূলতঃ অষ্টম সাধারণ অব্দ থেকে আরবভূখন্ডের বণিকেরা সমুদ্র-বাণিজ্যের ওপর একক কর্তৃত্ব আরওপ করেন। আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত আরবেরা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। আরব বণিকদের লেখনীতে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে সমুদ্র বন্দরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামাজিক জীবনের কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সমুদ্রবন্দরনবম শতকের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের আশেপাশে কোথাও এর অবস্থান ছিল। যাহোক, আরব নাবিক ও বণিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুলায়মান, ইবনে খুরদাদবিহ্, আল মাসুদি প্রমুখ। তাঁদের বর্ণনায় বাংলার সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্র এবং সুগন্ধী কাঠ সহ অন্যান্য অনেক পণ্যের তথ্য পাওয়া যায়।

উপরে তিন ধরনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কে তোমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছ। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে তথ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে কেবল তথ্য নিলেই চলবে না, উপযুক্ত পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা-বিশেষণ শেষে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা পর্যটকগণ কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় কিছু সময়ের জন্য বসবাস করতেন। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে যতটুকু ধরা পড়েছে তারা ততটুকু ই লিখেছেন।

ফলে লেখায় একপেশে তথ্য থাকতে পারে। আবার অন্য অঞ্চল থেকে আসা পর্যটকগণ অনেক ক্ষেত্রে শাসকদের আপ্যায়ন গ্রহণ করতেন। ফলে, তাঁদের বর্ণিত তথ্যে অনেক সময় সমাজের সাধারণ মানুষের বিবরণ অনুপস্থিত থাকত। এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলো থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। পর্যটকদের প্রায় সবাই প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় উৎপাদিত তুলা দিয়ে মসৃণ সূতিবস্ত্র তৈরি করা হতো বলে লিখে গেছেন। এগুলো সারাবিশ্বে সমাদৃত ছিল। মধ্যযুগেও বাংলা অঞ্চলের এই বস্ত্র ছিল অবিস্মরণীয় যা কীনা মসলিন নামে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল।

ইবনে বতুতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, বাংলায় যত সস্তায় জিনিসপত্র কীনতে পাওয়া যেত, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যেত না। কিন্তু সস্তায় জিনিসপত্র কেনার মতো সামর্থ্য কতজনের ছিল তা অবশ্য কোনো পর্যটকের লেখায় পাওয়া যায় না। বাংলা অঞ্চলে লেনদেনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে সোনা, রুপা এবং তামার পয়সার প্রচলন ছিল। তামার পয়সাকে বলা হতো জিতল। তবে সাধারণ মানুষ কড়ির মাধ্যমে বিনিময় করত। সমাজে শ্রেণিবৈষম্য প্রকট ছিল।

তাহলে পর্যটক কারা?

সহজ করে আরও একবার বলি- পর্যটক হলেন তাঁরাই যাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস, জীবন-যাপন, নানান বিশ্বাস ও প্রথা-পদ্ধতি, শিক্ষা ইত্যাদি জানার জন্য পৃথিবীর এক স্থান বা অঞ্চল থেকে আরেক স্থান বা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ন। বেড়তে বেড়তে তারা বিভিন্ন জায়গার সমাজ-সংস্কৃতি দেখেন, অধ্যয়ন করেন, পরের প্রজন্মকে জানানোর জন্য তা আবার কখনো কখনো লিখেও রাখেন। চাইলে আমরাও কিন্তু পর্যটক হতে পারি!

আমরা পর্যটক সম্পর্কে জানলাম যাদের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশ ও স্থানের তথ্য জানতে পারি। কিন্তু আমরা হয়তো একটু অবাক হয়ে যেতে পারি এই তথ্যও মানুষের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? চলো একটা খেলার মাধ্যমে এটি অনুধাবনের চেষ্টা করি।

তথ্য পরিবর্তন হওয়ার খেলা

আমরা ১০-১৫ জন মিলে একটি লাইন তৈরি করি। শিক্ষক লাইনে দাঁড়ানো প্রথমজনের কানে একটি গল্প খুব আস্তে বলবেন যেনো কেউ না শুনতে পারে। এভাবে প্রথমজন গল্পটি দ্বিতীয় জনের কানে বলবে। লাইনে শেষে যে থাকবে সে যে গল্পটি শুনতে পেলো তা জোরে বলবে। সর্বশেষ জনের বলা গল্পটি শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। এরপর শিক্ষক মূল গল্পটি বলবেন। আমরা বোর্ডে লেখা গল্পটির সঙ্গে মূল গল্পটি মিলিয়ে দেখব। গল্পটির কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা নির্ধারণ করব।

এভাবে এই খেলার মধ্য দিয়ে আমরা ঐতিহাসিক তথ্য যে বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারলাম।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একই ঐতিহাসিক ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বয়ান

ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিভিন্ন লেখক, গবেষক বা ইতিহাসবিদ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিভিন্নভাবে বয়ান করে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে বৃটিশ শাসন সম্পর্কে নিচে কয়েকজন লেখক ও ইতিহাসবিদের লেখা তুলে ধরা হলো। এখানে দুই ধরনের বয়ান আছে। আমরা এই বয়ানগুলোর সাদৃশ্য ও ভিন্নতা শনাক্ত করব।

বৃটিশ শাসন সম্পর্কে কয়েকজনের মতামত

০১ ভারতে ইংরেজ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলের বক্তব্য

"আমাদেরকে এমন একটি শ্রেণি গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে যারা আমাদের এবং আমাদের শাসনাধীন লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দোভাষী হতে পারে- তারা হবে রক্তে-বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ।" (সংগৃহিত, শশী থারুর, দ্য গার্ডিয়ান-অনুবাদ)

০২

১৮২৯ সালে বাংলার গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেনটিংক, ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা বন্ধের আইন জারি করেন

তার এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ৩০০ সুপরিচিত হিন্দু সমাজ সংস্কারক লর্ড বেন্টিংককে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, 'সজ্ঞানে নারী হত্যা করার যে দুর্নাম আমাদের চরিত্রের সাথে জুড়ে গিয়েছিল তা থেকে চিরতরে আমাদের মুক্তির জন্য ধন্যবাদ।' (সংগৃহিত সৌতিক বিশ্বাস, বিবিসি)

০৩

একটি বৃটিশ সাপ্তাহিকে ২রা ডিসেম্বর ১৯১১ সালে প্রকাশিত আর্টিকেল

আমরা (ব্রিটিশরা) ভারতকে কেবল অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং জীবনযাপন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাই দেইনি, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে গভীরভাবে পরিবর্তন করেছি।' (সংগৃহিত, সম্পাদক, THE ECONOMIC TIMES)

০৪

বৃটিশ অর্থনীতিবিদ আঙ্গুস ম্যাডিসন বলেন

আঠার শতকের শুরুতে পৃথিবীর অর্থনীতির ২৩ শতাংশ ছিল ভারতবর্ষের যা ছিল সম্পূর্ণ ইউরোপের সমান। বৃটিশরা যখন ভারত ছেড়ে যায় তখন তা কমে হয় ৩ শতাংশের একটু বেশি। (সংগৃহিত, শশী থারুর, An Era of Darkness)

দলগত কাজ ২:

আমরা পূর্বে গঠিত দলে বসি। উপরের লেখাগুলো পড়ে আমরা দলগতভাবে আলোচনা করে বৃটিশ শাসন সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ও ইতিহাসবিদদের ধারণা কী তা নির্ণয় করব?

আমরা প্রয়োজনে অন্য পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত প্রতিবেদন, বই, পত্রিকা, আর্টিকেল ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

আমরা তথ্য খুঁজি:

১. বৃটিশদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ

২. ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ইংরেজ

আমরা দলে আলোচনা করে এই দুই ধরনের প্রেক্ষাপটে প্রাপ্ত মতামতের ভিন্নতা যাচাই করব।

ক. মতামতের ভিন্নতা হবার কারণ।

খ. লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর মতামতের প্রভাব।

দলগত কাজ ৩:

আমরা দলগতভাবে ২ জন ব্যক্তি নির্ধারণ করব। এই দুইজন ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হবে। যেমন দুজন ভিন্ন পেশার মানুষ বা দুজন ভিন্ন অঞ্চলে বেড়ে ওঠা মানুষ। আমরা পাঠ্যপুস্তক বা অন্য কোনো উৎস থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বাছাই করব। ঐ ২ জন ব্যক্তির কাছে এই ঘটনা সম্পর্কে শুনে তাঁদের মতামত লিখে আনব। দুজন ব্যক্তির মতামতের ভিন্নতা এবং এই ভিন্নতার সম্ভাব্য কারণগুলো শনাক্ত করব। এরপর নিচের বিষয় নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করব।

- দুজন ব্যক্তির মতামতের ভিন্নতায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাব।
- ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব।

তারপর আমরা একটি ‘মতামতের ভিন্নতা’ নামক সেমিনারের আয়োজন করব। যেখানে আমরা দলগত আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে প্রাপ্ত তথ্য বা ফলাফল উপস্থাপন করব।